বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়

স্নাতকোত্তর শ্রেণী

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

২০২৩

রেজিস্ট্রেশন নং – 1550036 সাল – 2019-2020

রোল – PG/VUEGS54/BNG-IIS নং - 02

গবেষণাধর্মী প্রকল্প রচনা

পাঠমালা – BNG-205

-: প্রকল্পের বিষয় :-

বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়

স্নাতকোত্তর শ্রেণী

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

২০২৩

রেজিস্ট্রেশন নং – **1550036** সাল – **2019-2020**

রোল – PG/VUEGS54/BNG-IIS নং - 02

গবেষণাধর্মী প্রকল্প রচনা

পাঠমালা – BNG-205

-: প্রকল্পের বিষয় :-

জীবনানন্দ দাশের 'মহাপৃথিবী' : সময় ও সমাজ ভাবনা

বিষয় : জীবনানন্দ দাশের 'মহাপৃথিবী' : সময় ও সমাজভাবনা

স্বাক্ষর : অর্পিতা গুছাইত

তারিখ : ৩১.০৮.২৩

স্থান : বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর : [illegible]

তারিখ : ১১.০৮.২৩

স্থান : বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়

প্রস্তাবনা

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কাব্য সাহিত্যের ধারা নিয়ে আবির্ভাব ঘটেছিল সময় ও সমাজ সচেতন কবি জীবনানন্দ দাশ এর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নারকীয়তা, বিভৎসতা এবং অতি তুচ্ছ স্বার্থ নিয়ে মানুষের মধ্যে যে হানাহানি তা দেখে কবির মনে সংশয় জেগেছে। অন্তরের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় এই সংশয়কে অতিক্রম করে তিনি সত্যের সন্ধানে ঘুরেছেন। যদিও শেষপর্যন্ত তা তাঁর অধিগত হয়নি, এক সর্বগ্রাসী দুঃখ তাঁকে গ্রাস করেছে। এজন্যই তাঁর কবিতায় অন্ধকারে এত প্রগাঢ়তা, ধূসর বিবর্ণতার ছড়াছড়ি। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ গুলির মতো' মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে বিশ্বযুদ্ধের হতাশা, নৈরাশ্য, সংশয়, বিচ্ছেদ, মানসিক দ্বন্দ্ব ও জীবন অবক্ষয়ের কথা।

আমার গবেষণাধর্মী প্রকল্পের বিষয় কবি জীবনানন্দ দাশ এর ' মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থে সময় ও সমাজ ভাবনা। আমার এই প্রকল্পটি নির্বাচন থেকে শুরু করে সমস্ত সহায়তা ও নির্দেশনা দেওয়ার জন্য আমাদের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. আশিস অধিকারী মহাশয় ও অধ্যাপিকা ড. ছবি সরকার মহাশয়া এবং বিভাগীয় অন্যান্য অধ্যাপক - অধ্যাপিকাগণকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়াও মহাবিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার থেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি, তাই সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

সূচীপত্র

ক্রম. সং	বিষয়	পৃষ্ঠা সং
১	ভূমিকা	১- ২
২	কবি জীবনানন্দের কবিতায় সমকালীন সময় ও সমাজভাবনা	৩- ১১
৩	কবি জীবনানন্দ দাশের 'মহাপৃথিবী' কাব্যেঃ সময়চেতনা ও সমাজভাবনা	১২- ৩০
৪	'মহাপৃথিবী'; একালের পাঠকের চোখে	৩১- ৩৩
৫	উপসংহার	৩৪- ৩৫
৬	তথ্যসূত্র	৩৬- ৩৯
৭	সহায়ক গ্রন্থ	৪০

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান আধুনিক বাঙালি কবি হলেন কবি হলেন জীবনানন্দ দাশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে সারা পৃথিবী জুড়ে যে আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক পালা বদল চলছিল, শিল্প সাহিত্যেও তার অনিবার্য প্রভাব পড়েছিল। বাংলা কাব্যে তখনও রবি পক্ষের নিরবচ্ছিন্ন প্রভাব চলছে, তবু তারই মাঝে দেখা গেল 'কল্লোল' এর সাহসী পদচারণা। আমরা পেলাম জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব প্রমুখের মতো ভিন্ন পথের কবিদের। সমকাল ও প্রকৃতির ব্যতিক্রমী সাহচর্য জীবনানন্দকে বাংলা কাব্যের জগতে ভিন্ন পথের যাত্রী করে তুলেছিল। রবীন্দ্র সমকালে আধুনিক বাংলা কবিতায় রবীন্দ্র চিন্তার অনুসরণ ব্যাতিরেকে যে নতুন কিছু বলা যায় তা জীবনানন্দই প্রথম শুনিয়েছিলেন। বাংলা কবিতার জগতকে রবীন্দ্রনাথ তখন সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করে রেখেছিলেন ফলে সমকালের অন্যান্য কবিদের মতো জীবনানন্দের কাছেও একটা বড় সমস্যা ছিল রবীন্দ্র প্রভাবকে অতিক্রম করা। রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল বিশ্বাস শ্রান্তিহারক আশাবাদ জীবনানন্দের ছিল না, বরং ছিল যুগ সচেতনতার তিক্ত অভিজ্ঞতা, বিশ্ব পরিস্থিতির বিশৃঙ্খলতার পরিপ্রেক্ষিতে মানবিক বোধ সমূহের লাঞ্ছনায় তীব্র হতাশা। এই বোধ বিদেশী শিক্ষার পরিমার্জনা, জীবনানন্দ রবীন্দ্রমন্ডলে লালিত হওয়া সত্ত্বেও স্বতন্ত্র এক জগৎ গড়ে তোলায় সমর্থ হয়েছিল। সমকালে বাংলা কাব্যের জগতে তিনি হয়ে গেলেন নিঃসঙ্গ। তিনি কাব্যজগতে স্থির আদর্শ ও প্রত্যয় নিয়ে যতটা না নিজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তার চাইতে অনেক বেশি প্রভাবিত করেছেন পরবর্তীকালের কাব্য সাহিত্যিকে।

আধুনিক কবিতার সুর হল ব্যঙ্গপ্রধান। এই ব্যঙ্গ সমাজ ব্যবস্থার বিন্যাসকে আঘাত করেছে। বর্তমান সমাজ ও সভ্যতার শব বাহনের কাজ চলেছে কবিতায়। স্বভাবতঃ আধুনিক কাব্য ভাবাবেগ প্রধান নয়, মননধর্মী। আধুনিক কবিদের মতো তিনি পুরোপুরি ঐতিহ্য বিচ্যুত নয়। বিশেষত রবীন্দ্র কাব্যের ওপরে তার গভীর নির্ভরতা আছে। আর এই নির্ভরতা তাঁকে আহ্বান করেছে প্রেম ও প্রকৃতি চেতনার গভীরে, ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তর পেরিয়ে বোধের অন্তরে। যেখানে বনলতা সেন, ধানসিড়ি নদী, সুরঞ্জনা চিরকালীন দীপ্তি নিয়ে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক চেতনার প্রকাশ তার কাব্যে পরিস্ফুট শুধু আধুনিক কবিদের মতো অবক্ষয়ের শূণ্যতার ছবি এঁকেছেন নিঃশেষ হয়ে যায় নি। অভিজ্ঞতা ও বেদনার মধ্য দিয়ে ভাবী দিনের

ইঙ্গিত দিয়েছেন। বর্তমান যুগ নিঃসন্দেহে বন্ধ্যা - আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় এখানে কোন আনন্দের আস্বাদ নেই।

সমকাল ও প্রকৃতির ব্যতিক্রমী সাহচর্য জীবনানন্দকে বাংলা কাব্যের জগতে ভিন্ন পথের যাত্রী করে তুলেছিল। তিনি আরও একটা পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন। সেই পৃথিবীই ' মহাপৃথিবী'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ বছরে জীবনানন্দের কবিতাচর্চার সূত্রপাত ঘটলেও ১৯২০ সালে ' কল্লোল' পত্রিকায় তার প্রথম কবিরূপে আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয় ' মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থটি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নারকীয়তা ও বিভৎসতা প্রত্যক্ষদর্শী কবি অতি তুচ্ছ স্বার্থ নিয়ে মানুষের হানাহানির দ্রষ্টা কবি জীবনানন্দের মনে জেগেছে সংশয়। অন্তরের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় এই সংশয়কে অতিক্রম করে তিনি সত্যের সন্ধানে ঘুরেছেন। যদিও শেষপর্যন্ত তা তাঁর অধিগত হয়নি, এক সর্বগ্রাসী দুঃখ তাঁকে গ্রাস করেছে। এ জন্যই তাঁর কবিতায় অন্ধকারের এত প্রগাঢ়তা, ধূসর বিবর্ণতার ছড়াছড়ি।কবি উৎসবের গান গাইতে নারাজ এবং দুর্দশার রূপ বর্ণনা উভয়ই খন্ড সৃষ্টির পরিচায়ক। জীবনানন্দ প্রত্যক্ষ করেছেন এযুগের নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার দরিদ্র মানুষদের। অজস্র মৃত্যু কবিকে ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত করে। এই অপরিমেয় ক্লান্তির বোঝা বয়ে বয়ে অসহায় শূণ্যতা কবিকে অন্ধকারের প্রতি আসক্ত করে তোলে।

জীবনানন্দের কবিতাতে ইতিহাস চেতনা লক্ষ্য করা যায়। ' মহাপৃথিবী' কাব্যে পূর্বের বিষন্নতা ইতিহাস চেতনার সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে ঠিকই তবে সেই সঙ্গে কিন্তু ভাবনাও সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ' সিন্ধুসারস', ' হাওয়ার রাত', ' নগ্ন নির্জন হাত' প্রভৃতি কবিতায় ইতিহাস চেতনা ও কালচেতনা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে এসেছে।ইতিহাস চেতনা, কালচেতনা এবং তার পাশেই এসে যায় জীবনানন্দের প্রেম ভাবনার স্বাতন্ত্র্য। শুধু তাই নয়, যুগের আঘাতে কবিচিত্ত বিক্ষিপ্ত, মন থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রাচীন মূল্যবোধগুলি, প্রেম-সৌন্দর্য-জীবন জিজ্ঞাসা ও ধূসর প্রায়।

কবি জীবনানন্দের কাব্যে সমকালীন সময় ও সমাজভাবনা

উনিশ শতক থেকে যে বাংলা কবিতার ধারা প্রবাহিত হয়েছে, তাতে মানতেই হয় কবিরা একই সঙ্গে সমকালীন এবং তাদের রচনা সেই সময়ের দান। কোনো যুগন্ধর বা যুগোত্তীর্ণ কবিকে যখন সমসময়ের পটভূমিতে বিচার বা সমালোচনা করার কথা বলা হয়, তখন সেই কবির সঙ্গে সমকালের যোগ কতখানি কিংবা সমকালীন হয়েও তিনি সময়োত্তীর্ণ কিভাবে, দেখা হয়। সেই কবির কাব্যে সমকালের ছায়া ও প্রতিক্রিয়া কতখানি তাও দেখা হয়। বিশ শতকের অন্যতম আধুনিক বাঙালি কবি জীবনানন্দ দাশ। তিনি ছিলেন সময় সচেতন কবি।তাঁর কাব্যে মহাবিশ্বলোকের ইশারা থাকলেও তিনি মানেন কবিতার অস্থি-র ভিতরে থাকবে ইতিহাস-চেতনা। বিষাদ, অন্ধকার, ক্লান্তি, নিঃসঙ্গতা সত্ত্বেও তিনি যে আলোকার্থী, মানবপ্রেমিক তা টের পেতে অসুবিধা হয় না। জীবনানন্দ আসলে চান প্রজ্ঞা ও প্রেম। অথচ বাস্তব জগতে তা পান না। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক অভিজ্ঞতা তাঁকে বারংবার এক অন্ধকারের দিকে নিয়ে গেছে এতে সন্দেহ নেই। বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত পৃথিবীতে তিনি দেখেন রক্তস্রোত, হিংসা, আর সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি। লক্ষ্য করেছেন মানুষের অস্থিরতা, বেকারত্ব, চাতুরী আর উঁচু লোকেদের আনাগোনা। জাগরণে তিনি দেখতে পান -

" সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি
শুয়োরের আর্তনাদে উৎসব শুরু করেছে।"[৯]
(' অন্ধকার' : ' বনলতা সেন')

পুনর্জন্মে পাখি হওয়ার সাধ কিংবা লাশকাটা ঘরে টেবিলের ওপর শুয়ে থাকার সাধ তো জীবন-বিতৃষ্ণার পরিচয় দেয়। এই জগত ও জীবনে কবি কি দেখলেন, যাতে তাঁর বেঁচে থাকা অসহ্য মনে হয়? মনে হয় বেঁচে থাকা বড় ব্যথাময়, ভারময়। তাই অন্ধকারের আড়াল খোঁজা।' আট বছর আগের একদিন ' কবিতায় মৃত্যুকামী পুরুষটির কাছে নীরবতার জবানবন্দিতে তাই শুনি-

" কোনোদিন জাগিবে না আর
জাগিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম- অবিরাম ভার

সহিবে না আর ___"[২]

(' আট বছর আগের একদিন' : ' মহাপৃথিবী')

'বুদ্ধদেব বসু যেমন প্রেমিকাকে নামের বন্ধনে বেঁধে রেখেছেন জীবনানন্দ ও তেমনই প্রেমকে প্রকাশ করেছেন - বনলতা, অরুণিমা, শেফালিকা, মৃণালিনী ইত্যাদি নামের মধ্য দিয়ে। নামের সঙ্গে পদবী যোগ করে (বনলতা সেন, অরুণিমা সান্যাল, শেফালিকা বোস) জীবনানন্দ তাঁর নায়িকাকে আরও বেশি বাস্তব ও জীবন্ত করে তুলেছেন।'[৩] কবির মগ্ন চৈতন্য হাজার বছর ধরে পথ চলেছে পৃথিবীর পথে। একি কখনও সম্ভব? আসলে বাস্তবে তা সম্ভব না হলেও মগ্ন চৈতন্যে কবি পৌঁছে যান সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে। কবি বলেন-

" অনেক ঘুরেছি আমি, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে,
সেখানে ছিলাম আমি, আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে,"[৪]

(' বনলতা সেন' : ' বনলতা সেন')

এই পথ পরিক্রমায় অতীতের মায়া বিজড়িত একটা পৃথিবীর পরিচয় আভাসিত। সিংহল থেকে মালয় সাগর ঘুরে অশোক বিম্বিসার থেকেও প্রাচীনতর বিদর্ভ নগরে বিচরণ করায় তাঁর পৃথিবী প্রত্নমহিমা লাভ করেছে।

এই পরিক্রমায় ক্লান্ত কবি অন্বেষণ করেছেন নিরাপত্তা, স্বচ্ছলতা, সহমর্মিতার পরিণামে শান্তি। সেই শান্তি দিতে পারে নাটোরের বনলতা সেন। অতীতের প্রত্নধূসর জগৎ যেমন সুদূরের অনুষঙ্গ এনে দেয় তেমনি নাটোরের বনলতা সেন বর্তমানের ব্যঞ্জনাবাহী। জীবনানন্দ অতীত ও বর্তমানকালে একই সঙ্গে তার অস্তিত্বকে প্রকাশ করেছেন ক্ষণিক ও অনন্ত জীবনের দুটি দিকে। তাঁর মানসী ' বনলতা সেন' নাম, পদবী ও স্থান অনেক বেশি সত্য। বর্তমানের হয়েও দূরবর্তিনী সে, অপ্রাপনীয়া। দেখা না- দেখায় মেশা বিদ্যুৎলতার মতো এই নারী আমাদের চমকিত এবং চমৎকৃত করে। যে মুহূর্তে মনে হয় সে বুঝি কল্পলোকের, সেই মুহূর্তে কবি তার বাস্তব প্রেক্ষাপট, মানবিক ভঙ্গি দেখিয়ে তাকে বিশ্বাস্য ও বাস্তবের নারী করে তোলেন। তাই সব ঘুরে আসার পর দীর্ঘযাত্রার শান্তি বাংলার এক কোণে পাওয়ার তাৎপর্য মিশে গেছে ঘরে ফেরার আকুতির সঙ্গে। তাই শেষে উচ্চারিত হয় -

" আমারে দু-দন্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।"[৬]

(' বনলতা সেন' : ' বনলতা সেন')

হতাশার যন্ত্রণা, নৈরাশ্যের যন্ত্রণা, আর এই যন্ত্রণার মধ্যে কবিকে একটু শান্তি দিয়েছিলেন নাটোরের বনলতা সেন। আধুনিক মানুষের নিরাপত্তাহীন দীর্ণ মনের মুক্তি সন্ধান প্রেমের মধ্যে। স্থান, কাল, পদবী উল্লেখ করে কবি বনলতাকে একেবারে জীবন্ত রূপ দিয়েছেন। শ্রাবস্তীর সমৃদ্ধ কারুকার্য নায়িকা বনলতার মুখশ্রীর সৌন্দর্য বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন -

" চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য, ____"[৬]

(' বনলতা সেন' : ' বনলতা সেন')

তার চুল ' বিদিশার নিশা' বলা মাত্র তাতে কালিদাসীয় ঐতিহ্য ও রোমান্টিকতা ব্যাপ্ত হয়েছে। তার মুখে আছে বৌদ্ধ শিল্পীর বৌদ্ধিক প্রশান্তি, মৈত্রী ও প্রীতিঘন করুণা। প্রেমিকের মনে তার নিরাপত্তার অঙ্গীকার। সাময়িক শান্তির অবসানে মানুষের পুনরায় বেরিয়ে পড়া নতুন চলার পথে। সুখ ও সমৃদ্ধির খোঁজে মানুষের অক্লান্ত চলা।

কবির প্রেয়সী বনলতা জীবনের নৈরাশ্য ও বিপন্নতায় হালভাঙা নাবিকের সামনে সবুজ দ্বীপের হাতছানির মতো প্রতিভাত হয়। সে কেবল একটি বাক্যে বিপুল নির্ভরতার বাণী উচ্চারণ করে - ' এতদিন কোথায় ছিলে?' শুধু প্রেমিকের নয়, প্রেমিকার প্রতীক্ষায় মোমবাতির এ কবিতা আবেগ রক্তিমা। একজন প্রেমের জন্য ভ্রমণরত অন্যজন প্রতীক্ষায় মোমবাতির মতো জ্বলন্ত, জাগ্রত শিখা। এই ভাবের সমান্তরালে বলেছেন -

" পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।"[৭]

(' বনলতা সেন ' : ' বনলতা সেন')

পাখি সারাদিনের জীবন যুদ্ধের পর রাতের স্থিতি ও শান্তির আশ্রয় পায় তার নীড়ে। পাখির বাসায় ফেরা যেন তার স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন। সেখানে শুধু রাতের বিশ্রাম নয়, নিরাপত্তা ও আত্মীয় নৈকট্যের স্বাদ ভরা থাকে। যে নারীর চোখে সেই নীড়ের ছায়া আভাসিত হচ্ছে, তাঁর কাছ থেকেও এই আশ্রয়ের আশ্বাস ও শান্তি প্রত্যাশিত।

দিন শেষে সন্ধ্যার ছায়ায় নীরবতা নেমে আসে। বিশ্বচরাচর ব্যপ্ত হয় তমসাচ্ছন্নতায়। দিনযাত্রা শেষ হলেও শান্ত রাতের স্তব্ধতা, মনের গভীরে নেমে আসে জীবনের অবসানের ডাক। চিলের আকাশ পরিক্রমা সাঙ্গ হয়। ডানা থেকে রোদের গন্ধ মুছে ফেলে চিল। জীবিকার সন্ধানে রোদে পুড়ে যে চিল ঘরে ফেরে, সে নীড়ে খোঁজে শান্তি। কর্ম জগতের কোলাহল, ঘাম, দাহ যন্ত্রণাকে ঘরে আনতে চায় না। ক্লান্তিময় অন্ধকার তাকে প্রেরণা দেয়, তখন রোদের গন্ধ মানে রসাভাস ঘটানো। তাই তাকে মুছে ফেলা। জোনাকির রঙে পাণ্ডুলিপি রচনার মধ্যে দ্যোতিত হয়েছে প্রেমিক কবির নিজস্ব ভাষা বলার অবকাশ।

বনলতা সেন তখন আর প্রেয়সী নারী মাত্র নয়, সে সব চরিতার্থতার শেষ আশ্রয়। সব জানা অজানার স্তব্ধতায় আঁধারে লগ্ন অনুভবের অতলতায় নিমজ্জন। দুজনে মুখোমুখি বসে প্রাণের কথা বলা -

> " সব পাখি ঘরে আসে - সব নদী-ফুরায় এ জীবনের
> লেনদেন,
> থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।"[৮]
>
> (' বনলতা সেন' : ' বনলতা সেন')

এই প্রত্যাবর্তন ফুরিয়ে যাওয়ার নয় । নদী যেমন সাগরে মেশে, পাখি যেমন নীড়ে ফেরে রাত শেষ হলে পুনরায় সচঞ্চল হয়। আপাত বিশ্রামের মধ্যে আছে শক্তি ও উদ্দীপনা সঞ্চয় করে নতুন হয়ে জেগে ওঠা। জীবনের লেনদেন ফুরানোর অর্থ জাগতিক চাওয়া- পাওয়া, দেনাপাওনা স্থূলতা ঘুচিয়ে দেওয়া। একালের বিধ্বস্ত, বিচ্ছিন্ন, কর্মক্লান্ত মানুষের কাছে ' বনলতা সেন' দারুচিনি দ্বীপের সবুজ ঘাসের দেশ - কোন মরিচীকা নয়, বলা যায়।

প্রত্নধূসর আবহে স্থাপিত হয়েও বনলতা সেনের অস্তিত্ব ক্ষণমুহূর্তের আঁধারে ছাপিয়ে অনন্তের ব্যপ্তিতে মিশেছে। কালের প্রবাহে ভাসিয়ে দিয়ে বনলতা সেনের প্রেমচেতনা ইতিহাসের আশ্রয়ে, প্রকৃতির সান্নিধ্যে ক্ষণিক থেকে অনন্তের মহিমা লাভ করেছে। আলোকার্থী কবি নিজের দ্বীপশিখাটি জ্বালালেন এবং তা হয়ে উঠল নিজস্ব বর্তিকা। সেই আলোয় উদ্ভাসিত বনলতা সেন কেবল কবির নয়, সকলের ' উজ্জ্বল উদ্ধার' এক চিরন্তনী নারী হয়ে উঠেছে।

যথার্থ সৎ ও মহৎ কবির কাব্যদর্শ ও জীবনবোধ কেমন, নির্দেশ করতে গিয়ে এলিয়ট বলেছেন, " A great poet is as much influenced by his time"[৯]। জীবনানন্দ সম্পর্কে এ মন্তব্য যে সার্থক বলা যায়। কেননা, তিনি নিজেও সময়চেতনা, ইতিহাস চেতনাকে কবিতার অন্তঃসার রূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁর ' শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থের অন্তর্গত ' ১৯৪৬-৪৭' কবিতার নামকরণেই যে দ্বিধা ফুটে উঠেছে, তা এক বিমূঢ় যুগের উদ্ভ্রান্তিকে ইঙ্গিত করে। কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ' পূর্বাশা' পত্রিকায়, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায়। জীবনানন্দের ইতিহাস চেতনা, মানবচেতনা ও সমাজচেতনার ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছে আলোচ্য কবিতায়। শতাব্দীর রাক্ষসীবেলায় দাঁড়িয়ে জীবনানন্দ লক্ষ্য করেছেন, লোভ, হিংসা, যুদ্ধ, রক্ত কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এ যেন এক নষ্ট পৃথিবী, যেখানে প্রতিনিয়ত অদ্ভূত আঁধারের আনাগোনা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রেশ কাটতে না কাটতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামাম বেজে উঠেছে। যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে কালোবাজারীর দল মুনাফার লোভে সৃষ্টি করেছে কৃত্রিম অনাভাব, দুর্ভিক্ষ। ১৯৪২ এর অগাস্টে মহাত্মা গান্ধীর 'ভারতছাড়ো' আন্দোলন দেশ জুড়ে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে। ১৯৪৫ এ যুদ্ধ থামলেও ভেদবুদ্ধির বিষাক্ত তীরে ভারতাত্মা বিদ্ধ হলো। ১৯৪৬ এর ১৬ ই অগাস্ট সময়টা স্বাধীনতার ঠিক আগেই, ইংরেজ সরকারের বিভিন্ন আন্দোলনের চাপে যখন বুঝল ভারতকে নিজেদের অধীনে করা সম্ভব নয়, তখন চতুর ইংরেজ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে দিলো। শুরু হলো রক্তের হোলিখেলা। মানুষে মানুষে না রইলো ভালোবাসা না রইলো বিশ্বাস। অদ্ভুত নৈরাজ্যে মানুষ দিশেহারা । পরিত্রাণ করার মতো কেউ কোথাও নেই। এ যেন কবি ইয়েটস এর ' The second coming' কবিতার সংকটকাল-

" Things fall apart, the centre cannot hold,
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed and everywhere
The ceremony of innocence is drowned,"[১০]

(The second coming)

বিশ্বাসভঙ্গে, সরলতা ও প্রেমের মৃত্যু দেখে ব্যথিত কবি জীবনানন্দ মধ্যমপথে দাঁড়িয়ে - অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যেতে চেয়ে যে যুগের ভাষ্য লেখেন, তাই

'১৯৪৬-৪৭' কবিতা। একদিকে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি, অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণতির প্রেক্ষাপটে কবি কবিতাটি রচনা করেছেন।

কবিতাটির ভাবগত উত্থান-পতন অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে স্পষ্টতা-অস্পষ্টতা, আলো আঁধারের বিরোধভাসী তাৎপর্যের বিস্তারে। প্রথমেই দেখা যায়, দিনের আলোর স্পষ্টতার বিপরীতে মানুষের কর্মকাণ্ডের অস্পষ্ট ব্যস্ততাকে। জটিল মানুষ ও মানসিকতা এই অস্পষ্টতা এনেছে। সততার অভাব ও লুব্ধতা যে কুয়াশা সৃষ্টি করেছে, সেখানে আলো পৌঁছায় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর নাগরিক জীবনে আলোর মধ্যে ভেসে উঠেছে অশুভ প্রতিযোগিতার নানা ইঙ্গিত। স্পষ্ট করে কবি জানিয়েছেন -

" পৃথিবীর সুদখাটে, সকলের জন্য নয়।
অনির্বচনীয় হুন্ডি একজন-দুজনের হাতে।
পৃথিবীর এইসব উঁচু লোকদের দাবি এসে
সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।" [১১]

('১৯৪৬-৪৭' : ' শ্রেষ্ঠ কবিতা')

অসাধু মুনাফাবাজ এইসব মানুষদের কবি তীব্র ব্যঙ্গবানে বিদ্ধ করেছেন। এরা পরকে ফাঁকি দিয়ে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত।

এই জগতের সুবিধাভোগী উঁচু লোকগুলো ছাড়া বাকি সব মানুষকে কবি দেখেছেন এক ব্যপ্ত ক্রমায়ত হৈমন্তিক অন্ধকারের পটে।অস্তিত্বের প্রবল বৈনাশিক অভিকর্ষে তারা কেবলই হেমন্তের ঝরে পড়া পাতার মতো স্খলিত হতে থাকে। যদিও জন্ম- মৃত্যুচক্রে আবর্তিত হয়ে তারাও আশা করে, 'পৃথিবীর কোনো পুনঃ প্রবাহের বীজের ভিতরে মিশে গিয়ে' আবার জন্ম নেবে। সূর্যের গন্ধে, ধুলো ঘাস কুসুমের অমৃতত্বের আস্বাদ তৃপ্ত হবে। তাই কবি বলেন -

" তাহলে মৃত্যুর আগে আলো অন্ন আকাশ নারীকে
কিছুটা সুস্থিরভাবে পেলে ভালো হতো।" [১২]

('১৯৪৬-৪৭' :' শ্রেষ্ঠ কবিতা')

শহরের মতো গ্রাম ও যুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জর্জরিত হয়ে অকাল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। শহর কলকাতায় যখন সুযোগ সন্ধানীর ভিড় তখন ' বাংলার লক্ষগ্রাম

নিরাশায় আলোকহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল। কর্মহীন বাংলা শ্রীহীন। সেখানে ' মানুষ নেই ' অর্থাৎ মনুষ্যত্বের বড় অভাব। একদিন সেখানে নবান্নের উৎসব মুখর দিনে নতুন চালের গন্ধে সবাই মাতোয়ারা হত, কাক পাখিরা উড়ত। লোকায়ত উৎসবে সকলে প্রীতির বাঁধনে বাঁধা পড়ত। অথচ আজ কিছু স্বার্থপর মানুষের চক্রান্তে জীবনের বদলে গ্রামে এখন মৃত্যুর উৎসব। ধূসর গ্রাম বাংলার একদা ঐশ্বর্যময় রূপ স্মরণ করে কবি লেখেন -

" ওখানে চাঁদের রাতে প্রান্তরে চাষার নাচ হতো
ধানের অদ্ভূত রস খেয়ে ফেলে মাঝি বাগদির
ঈশ্বরী মেয়ের সাথে বিবাহের কিছু আগে-বিবাহের কিছু পরে
সন্তানের জন্মাবার-আগে।" [১৩]

('১৯৪৬-৪৭' : ' শ্রেষ্ঠ কবিতা')

জমিদারি শোষণ শাসন তাদের জীবন থেকে প্রেম ভালোবাসা কেড়ে নিতে পারে নি, নবান্ন হয়, মন বিনিময় হয়। সেদিনের মাঝি বাগদির মেয়ে আজ কবির চোখে ' ঈশ্বরী'। প্রপিতামহগণ ' হেসে খেলে ভালোবেসে' জীবন কাটিয়েছেন, এরা ' স্পষ্ট জগতের অধিবাসী ' ছিলেন। একালে সব অস্পষ্ট, কুটিল, ঈর্ষাতুর, অর্ধসত্য সর্বত্র - ' সকলেই আড় চোখে সকলকে দেখে'।

সৃষ্টির মনের কথা কবির দ্বেষ বলে মনে হয়েছে। সেখানে আন্তরিকতার বড়ো অভাব। পদে পদে প্রতাপের, প্রভুত্বের নখদাঁত বেরিয়ে পড়েছে। পাহাড়ী ঝর্ণার জলে রূপে মুগ্ধ হওয়ার পরিবর্তে দেখা যায় ' প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল হয়ে আছে'। ' বাঘ হরিণের পিছু ধায়'। জীবনানন্দ ছেচল্লিশের রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা স্মরণ করে নিজেকেই দায়ী ভেবে লিখেছেন -

" মানুষ মেরেছি আমি - তার রক্তে আমার শরীর
ভরে গেছে, পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি, আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
হৃদয় কঠিন হয়ে বধ করে গেল।" [১৪]

('১৯৪৬-৪৭' : ' শ্রেষ্ঠ কবিতা')

ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রক্তের নদীতে শুয়ে আছে ইয়াসিন, মকবুল, হানিফ কিংবা গগন, বিপিন, শশীরা - ' জীবনের ইতর শ্রেণীর মানুষ তো এরা সব'। এদের আন্তরিক

আহ্বানের মধ্যেই ' সৃষ্টির অপরিক্লান্ত চারণার বেগে' প্রাণকণা জেগে ওঠে অনুপম কণ্ঠের সঙ্গীতে। দেশকালের অধিষ্ঠান আজ মানব অস্তিত্বে। কিন্তু চিরমানবের পূর্ণজীবনের স্বপ্ন, অনন্ত অমৃত অস্তিত্বের বোধি, যা আজ এই খন্ড সময়ের চাপে শতধা- তাই কবির অনুভাবনায়, বারবার ফিরে আসে সূর্যের নিভে যাওয়া চিত্রে। একালীন সভ্যতায় কবি বড় বড় নগরীর বুকভরা ব্যথা, দীর্ঘশ্বাস ছাড়া কিছুই পান না। মাতৃগর্ভের অন্ধকারে যে স্নেহরস ও নিরাপত্তা আছে তাকে কাম্য মনে করেন। এই অন্ধকার তো আলোর অধিক। কিন্তু সেই প্রশান্ত অন্ধকার কই? ছেচল্লিশের আমিষাশী অন্ধকারে মানুষের রক্তাক্ত আত্মায় সুবাতাস চান কবি। চেয়েছেন নির্মলতা।

দুটি বিশ্বযুদ্ধের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার পটভূমিতে 'বনলতা সেন' কাব্যটিতে ধরা পড়েছে ' পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান, কবিতার অস্থিতে আছে ইতিহাস চেতনা' এবং ভারাক্রান্ত হওয়ার আবেশ। যেখানে ব্যক্তি প্রেমের আবেগ মিশে আছে। আবার সেই সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্র বিষয়ে কবির গভীর ভাবনা, উদ্বেগ ও আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে। ' বনলতা সেন' কাব্যটিতে বোঝা যায়, কেন কবি ' ক্লান্ত প্রাণ ' এবং নীড় প্রত্যাশী। ব্যক্তিগত এই নিভৃত কামনার পাশেই কবির মনে এই বেদনা ও প্রশ্ন জেগেছে, সব মানুষের মঙ্গল কবে হবে? পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া কি শুধু যন্ত্রণা পেতে? ব্যর্থ হতে? হতাশায় ডুবে যেতে? মানুষ কি মানুষের পাশে দাঁড়াবে না? তাঁর ' মৃত্যু স্বপ্ন সংকল্প ' কবিতায় এজন্যই কবি লিখেছেন -

" আমরা জেগেছি - তবু জাগাতে পারি নি,
আলো ছিল - প্রদীপের বেষ্টনী নেই,
কাজ ছিল - শুরু হলো না তো।"[১৫]

(' মৃত্যু স্বপ্ন সংকল্প' : ' বেলা অবেলা কালবেলা')

কবি যখন পৃথিবীর রণরক্ত সফলতার কথা, কলকাতার কল্লোলিনী তিলোত্তমা হওয়ার কথা বলেন তখন প্রেমের ভূমিকা নিয়ে সংশয় জাগে। জীবন ও পৃথিবীর হিংসা রণরক্ত সফলতা বিফলতাকে মানেন, কিন্তু শেষ সত্য বলে মানেন না, তখন শুধু সুচেতনার কাছে হৃদয় নিষ্কলুষ রাখতে চান, সুচেতনাকে সঙ্গিনী করেই পৃথিবীর ক্রম মুক্তির সাধনার কথা ভাবেন, তখন তিনি পলাতক দূরতর দ্বীপে, সুচেতনায়। কবি যখনই বর্তমান পৃথিবীর মানুষকে ভালোবাসতে চান তখনই বাস্তবকে অনুভব করেন -

" ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু
দেখেছি আমার হাতে হয়তো নিহত
ভাইবোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে,"[১৬]

('সুচেতনা' : ' বনলতা সেন')

মানব সভ্যতার প্রাপ্তিকে জাহাজে আমদানি পণ্যের সঙ্গে উপমিত করেছেন কবি। সেই শস্য আসলে অসংখ্য মানুষের শব দেহ। শোষণে, পীড়নে, শক্তি মত্ততায় ভোগের তীব্র বাসনায় মানুষ তা সংগ্রহ করে যা স্তূপীকৃত করছে, সভ্যতার প্রাপ্তিতে ঘাতকতার পাপ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে ঐতিহ্যের বিস্ময়কর ঔজ্জ্বল্য -

" শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়
আমাদের পিতা বুদ্ধ কনফুশিয়াসের আমাদেরো প্রাণ
মূক করে রাখে।"[১৭]

('সুচেতনা' : ' বনলতা সেন')

শোষণ পীড়ন হত্যার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মানবসভ্যতার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। শবজীবী সভ্যতার বিরুদ্ধে বুদ্ধ, কনফুশিয়াস প্রমুখ মনীষীদের নীরব হয়ে থাকাকে কটাক্ষ করেছেন।

‘ মহাপৃথিবী ’ : সময়চেতনা ও সমাজভাবনা

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান আধুনিক বাঙালি কবি হলেন কবি জীবনানন্দ দাশ। তিনি ছিলেন সময় ও সমাজ সচেতন কবি।তাঁর কবিতায় পরাবাস্তব দেখা যায়। কাব্যগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলির মতোই' মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে বিশ্বযুদ্ধের হতাশা, নৈরাশ্য, সংশয়, বিচ্ছেদ, মানসিক দ্বন্দ্ব ও জীবন অবক্ষয়ের কথা। কবি পৃথিবীর পথ ধরে অনন্তকাল হেঁটেছেন ।ক্লান্ত হয়েছেন বারবার, একটা রক্তচক্ষু বারবার মুক্তচেতনা, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্যপূর্ন চিন্তাও মনকে দমন করে চলেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ বছরে জীবনানন্দের কবিতাচর্চার সূত্রপাত ঘটলেও ১৯২০ সালে 'কল্লোল' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিরূপে আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৪৪ সালে 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নারকীয়তা ও বিভৎসতার প্রত্যক্ষদর্শী কবি অতি তুচ্ছ স্বার্থ নিয়ে মানুষের হানাহানির দ্রষ্টা কবি জীবনানন্দের মনে জেগেছে সংশয়। অন্তরের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় এই সংশয়কে অতিক্রম করে তিনি সত্যের সন্ধানে ঘুরেছেন। যদি ও শেষ পর্যন্ত তা তাঁর অধিগত হয়নি, এক সর্বগ্রাসী দুঃখ তাঁকে গ্রাস করেছে। এজন্যই তাঁর কবিতায় অন্ধকারের এত প্রগাঢ়তা, ধূসর বিবর্ণতার ছড়াছড়ি। কবি উৎসবের গান গাইতে নারাজ এবং দুর্দশার রূপ বর্ণনা উভয়ই খন্ড সৃষ্টির পরিচায়ক। কবি জীবনানন্দ প্রত্যক্ষ বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান আধুনিক বাঙালি কবি হলেন করেছেন এযুগের নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার দরিদ্র মানুষদের। অজস্র মৃত্যু কবিকে ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত করে। "মহাপৃথিবী" কাব্যে পূর্বের বিষন্নতা ইতিহাস চেতনার সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে ঠিকই তবে সেই সঙ্গে নতুন ভাবনা ও সন্নিবিষ্ট হয়েছে।' হাওয়ার রাত', ' নগ্ন নির্জন হাত', ' সিন্ধুসারস' প্রভৃতি কবিতায় ইতিহাস চেতনা ও কালচেতনা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে এসেছে ।

১.আট বছর আগের একদিন

' ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থের 'বোধ' এর জন্মের ঠিক আট বছর পরেই আত্মপ্রকাশ করেছিল জীবনানন্দের' মহাপৃথিবী'র ' আট বছর আগের একদিন' কবিতাটি। ভাবের দিক থেকে 'বোধ' কবিতার সঙ্গে 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার মিল আমাদের চোখে পড়ে। যে শূন্যতার মধ্যে একজন মানুষ ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছিলো, তারই যেনো রহস্য উন্মোচিত হলো 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায়।

'শোনা গেল লাশ কাটা ঘরে' - পংক্তিটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা উপলব্ধি করি একটা চমৎকারিত্ব ।কবিতাটির শুরুতেই আমরা একটা মানুষের শেষ পরিণতির সংবাদ পাই ।প্রথম থেকেই কবিতাটিতে একটা রহস্যের গা ছম ছমে ভাব ফুটে উঠেছে । কবিতাটিতে প্রথমেই দেখা যায়, মানুষটির মৃত্যু বাসনার ইচ্ছার সময়টি নির্দেশ করা হয়েছে -

" কাল রাতে - ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হলো তার সাধ" [১৮]

('আট বছর আগের একদিন': 'মহাপৃথিবী')

কোনো এক ফাল্গুনের রাতে মানুষটি আত্মহত্যা করেছে ।যখন রাতের আঁধারে পঞ্চমীর চাঁদ নিভে গেল তখনই তার মরবার সাধ হলো।পঞ্চমীর চাঁদ যেমন ডুবে যাচ্ছে অন্ধকার গর্ভের ভেতরে, তেমনি যুবকটি ডুবে যাচ্ছে মৃত্যুর অন্ধকার অতলে।

ঠিক এরপরেই দ্বিতীয় স্তবকে দেখা যায়, যা যা পেলে সাধারণ মানুষেরা সুখী হয় - তা সবই ছিল যুবকটির কাছে। আমরা জানি, তার পাশেই শুয়ে ছিল তার শিশু সন্তান ও প্রেমময়ী বধূ ।ফাল্গুনী পূর্ণিমার সে-রাত তার কাছে ছিলো অমৃতের মতো। স্ত্রী এবং সন্তানের প্রতি স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা সবই ছিলো। তবুও কেনো যুবকটি প্রেম ও ভালোবাসা কে অগ্রাহ্য করে আত্মহননের পথ বেছে নিলো?

"বধূ শুয়েছিলো পাশে - শিশুটিও ছিলো,
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো- জ্যোৎস্নায়..."[১৯]

('আট বছর আগের একদিন':' মহাপৃথিবী')

হয়তো ঐ আশা ও প্রেমের মধ্যেও কোথাও না কোথাও অতৃপ্তবোধ থেকে গিয়েছিল। আর এজন্যই যুবকটি জীবনের অন্তিম পরিণতি ঘটিয়ে অসুখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য চিরনিদ্রায় মগ্ন হয়েছেন। কবির ভাষাতেই তা স্পষ্ট -

" ঘুম কেনো ভেঙে গেলো তার?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল - লাশকাটা ঘরে শুয়ে
ঘুমায় এবার।"[২০]

('আট বছর আগের একদিন':' মহাপৃথিবী')

'বোধ' কবিতায় কবি যে ক্লান্তি অনুভব করেছিলেন, সেই ক্লান্তিবোধ 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাতেও দেখা যায়। আর তার অসহ্য যন্ত্রণার জন্যই যুবকটি সম্ভবত আত্মঘাতী হয়েছে। এবং আত্মঘাতী মানুষটি শান্তিতে বহুকাল ঘুমোতে পারেনি বলেই, শান্তি পাওয়ার কামনায় আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে চিরনিদ্রায় মগ্ন হতে। ' উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা ' বলার মধ্য দিয়ে এক অচেনা, রোমহর্ষক অশুভ লক্ষণের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যা সর্বনাশের এক ভয়াবহ চিন্তায় নির্বাক করে দেয়। মৃত যুবকটিকে আত্মহত্যার হাতছানি দিয়েছিলো ঐ ' নিস্তব্ধতা'।

এরপরেই কবি আত্মহননকারী যুবকের মৃত্যুর পাশাপাশি বিপরীত মেরুতে কয়েকটি জীবন উল্লাসের ছবি আঁকেন। আর দৃশ্যগুলির মধ্যে আমরা পাই পেঁচা, ব্যাঙ, মশা, মাছি ও ফড়িং এর মতো প্রাণীদের।ভাবে ব্যঞ্জনায় যারা মনুষ্যজগতেরই প্রাণী।
মানুষের অভিষ্ট সব প্রাপ্তির ভেতরেই লুকিয়ে রয়েছে গভীর অসুখ ও অসুস্থতার লক্ষণগুলি। যারা মানুষকে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে করে করে খাচ্ছে। সুখের মধ্যে থেকেও অন্তরের এক তীব্র রিক্ততাবোধ এর যন্ত্রণায় যুবকটি বেছে নিতে বাধ্য হয় নিজের আত্মহননের পথ। ' তবু সে

দেখিল কোন ভূত?' এই 'তবু' শব্দটির মধ্যে একটা বিস্ময় থেকে যায়।সে বিস্ময়ের ভেতরে আমরা পাই আত্মহননকারী যুবকটির বিপরীতে জীবনপিপাসু প্রাণীদের অন্য জগতের ঠিকানা। পেঁচা যেমন জেগে থাকে উজ্জ্বল আলোয় ভীত হয়ে অন্ধকারে, গলিত স্থবির ব্যাঙ অপেক্ষা করে থাকে এক নতুন সকালের আশায়, মশারির ক্ষমাহীন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মশা ভালোবাসে তার স্বাভাবিক জীবনকে, এবং মাছিও রক্ত-পুঁজে দূষিত পরিবেশের মধ্যে বসবাস করেও শেষপর্যন্ত ঝকঝকে রোদ্দুরের দিকে উড়ে যায়। তেমনি কবির ভাবনার একদিকে শুরু হয় জীবনবিমুখতার নেতিবাচক দিকটি, আর একদিকে প্রবাহিত হতে দেখা যায় জীবনের ইতিবাচক দিকটিকে। কবি আত্মহননকারী যুবকটিকে সহজেই সম্বোধন করে বলতে পারেন -

" অশ্বত্থের শাখা
করেনি কি প্রতিবাদ? জোনাকির ভিড় এসে সোনালি
ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে
করেনি কি মাখামাখি?
থুরথুরে অন্ধ পেঁচা এসে
বলেনি কি : ' বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনো জলে ভেসে?
চমৎকার!
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার।
জানায়নি পেঁচা এসে এ তুমুল গাঢ় সমাচার?" [২৯]

('আট বছর আগের একদিন':' মহাপৃথিবী')

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। যখন ফাল্গুনের রাতের অন্ধকারে পঞ্চমীর চাঁদ ডুবে গেলে যুবকটির আত্মহননের বাসনা জেগেছিল, তখনই কিন্তু অন্যদিকে দেখা গিয়েছিল পাশাপাশি ক' টি প্রাণীর জীবজগতের একান্ত মগ্নতা। কাজেই, পারিপার্শ্বিক জীব ও প্রকৃতি জগতের দিকে যুবকটি খুঁজে পায়নি প্রকৃত আত্মার তৃপ্তি। যা তাকে এনে দিতে পারত একই সঙ্গে সুখ ও শান্তি এবং বেঁচে থাকার অদ্যম ইচ্ছাশক্তি।

এরপর কবি আত্মসুখময় জীবনের কথা বলেছেন। আর জীবনে সবকিছু ছিল বলেই যুবকটির চেতনা বোধ ভোঁতা হয়ে যায়নি। কিন্তু আরো এক বিপন্ন বিস্ময় তাকে তাড়া করে ফিরছে,ক্লান্ত থেকে ক্লান্ততর করেছে, ঠেলে দিয়েছে একাকীত্বের দিকে। আর এই একাকীত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই যুবকটি বেছে নিয়েছে আত্মহননের পথ। কবির ভাষাতে তা স্বচ্ছ -

" শোনো
তবু এ মৃতের গল্প, কোনো
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই,
বিবাহিত জীবনের সাধ
কোথাও রাখেনি কোনো খাদ,
সময়ের উদ্ধর্তনে উঠে এসে বধূ
মধু - আর মননের মধু
দিয়েছে জানিতে,
হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ-জীবন কোন দিন কেঁপে ওঠে নাই,
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে।" [২২]

('আট বছর আগের একদিন':' মহাপৃথিবী')

কবিতাটির প্রথম দিকেও আমরা পেয়েছি কিছু সুখময় জীবনের স্পর্শ - 'বধূ ও ছিলো পাশে - শিশুটিও ছিলো'। এই স্তবকটির প্রথম পংক্তিতে ' শোনো' শব্দটিতে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। মৃতের গল্প হলেও গল্পটি শোনার মতো - যেহেতু তা আমাদের জাগতিক অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে সত্তার গভীরতাকে স্পর্শ করে। মৃত যুবকটির বিবাহিত জীবনে কোনো শূন্যতা ছিলো না। জীবনসঙ্গিনী তাকে উষ্ণ সাহচর্য দিয়ে হৃদয় এবং মস্তিষ্কের পরিতৃপ্তি ঘটিয়েছে। এমনকি দারিদ্রের যন্ত্রণা গ্লানিও তাকে পেতে হয়নি। তাহলে কি অভাব-অনটনহীন সুখী তৃপ্ত জীবন ছিল বলেই যুবকটি শেষপর্যন্ত আত্মহননের পথে এগিয়ে যায়? এমনটাও তো হতে পারে, ঐ পার্থিব সুখ ও পরিতৃপ্তির আড়ালে চাপা পড়ে গিয়েছিলো তার জীবনের

গভীরতম অ-সুখ। স্পষ্ট ভাষাতেই তিনি জানান গৃহজীবনের সব সুখ শান্তি মানুষের কাছে পরিপূর্ণতা আনে না। আর তা পারে না বলেই কবি বলতে বাধ্য হন-

" জানি - তবু জানি
নারীর হৃদয় - প্রেম - শিশু - গৃহ - নয় সবখানি
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয় -
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতর
খেলা করে,"[২৩]

('আট বছর আগের একদিন':' মহাপৃথিবী')

২. হায় চিল

জীবনানন্দের কাব্যে পশু-পাখি বা তির্যক প্রাণীর ভিড় দেখা যায়। কবির প্রকৃতির দৃষ্টান্তরূপে শুধু নয়, কবিমানসের বিশেষ ভাবনা বা তত্ত্বের বাহনও তারা। হাঁস, পেঁচা, চিল, শালিক ইত্যাদি পাখিদের কথা যদি ভাবা যায়, দেখা যাবে, তারা কেবল পাখি নয়, কবির মনোভঙ্গিরও প্রতীক। ' হায় চিল' কবিতাটির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে কিভাবে তিরিশের দশকের সন্দেহ, গ্লানি, হতাশা গ্রাস করেছে মানুষকে। চিলের মধ্যে প্রাণসত্তা আরোপ করা হচ্ছে। চিল কেবল শুধু চিল নয়, চিলের মধ্য দিয়ে অসহায় মানুষের আর্তনাদ-এর প্রতিফলন ঘটেছে। চিল হলো জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত এক ক্লান্ত পথিক। চিল পাখিটি তাঁর কাব্যে বিরহী প্রেমিক রূপে এসেছে। সাধারনভাবে চিল এখানে গগনবিহারী নিঃসঙ্গ প্রেমিক। কবিতাটিতে মেঘলা দিনের বিষণ্ণতা যেন প্রেমের বিরহের স্রোত পাঠ করিয়েছেন কবি-

" হায় চিল,সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!"[২৪]

(' হায় চিল':' মহাপৃথিবী')

কোনো এক ভিজে মেঘের দুপুরে একটি চিলকে উড়ে যেতে দেখা যায়। যার সোনালি ডানায় কোনো সুখের উল্লাস নেই, তার উড়ে চলার মধ্যে কান্না ঝরে পড়ে। ধানসিড়ি নদীর পাশে সে একা একা ঘোরে, কাঁদে।

" তোমার কান্নার সুর বেতের ফলের মতো ম্লান চোখ মনে আসে,
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চ'লে গেছে রূপ নিয়ে দূরে" [২৫]
(' হায় চিল':' মহাপৃথিবী')

এই ম্লান চোখ হল তিরিশের দশকের মানুষের মধ্যে যে বোধ, জীবনের প্রতি যে ক্লান্তি অনিহা তার ফলেই তাদের চোখের দৃষ্টি আজ স্বচ্ছ নয়, সেখানে যেনো ক্লান্তি ধরা পড়ে। যার কান্নার সুর কবির মনে আনে এক রাজকন্যার কথা। দুপুর বেলাতেই যেনো সন্ধ্যা নেমে এসেছে, তখন চিলের কান্নার সঙ্গে কবির হৃদয় সাযুয্য লাভ করে যে সুর সৃষ্টি করে তা কবির কল্পনা ও মননের যুগ্ম ফল। তাঁর বিরহ ও শূন্যতা বোধের কারণ পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো কবির মানসী রূপ নিয়ে দূরে চলে গেছে। আজ তার অনুপস্থিতি বড় বেদনাময়। শুধু এক আর্তপ্রশ্ন প্রতিধ্বনিত হয় –

" কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে।" [২৬]
('হায় চিল':' মহাপৃথিবী')

৩. বিড়াল

কবি জীবনানন্দের কবিতায়'বিড়াল' প্রকাশ্যে কোনো বক্তব্যের বাহন নয়। সে বাস্তব ও পরাবাস্তব লোকে একই সঙ্গে বিচরণ করছে। যাকে দেখা যায় ' গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতরে, বাদামী পাতার ভিড়ে। যে বিড়াল খুশি হয়' কয়েক টুকরো মাছের কাঁটা'য়। কখনো বা দেখা যায় সে' নিজের হৃদয় নিয়ে নিমগ্ন। তার আচরণে এক অসংলগ্নতা কবিকে বিস্মিত করে। তিনি দেখেন, কখনো সে' কৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে', কখনো বা সূর্যের

পেছনে চলছে। দেখা না দেখায় মেশা বিড়ালটি অবশেষে অন্ধকারকে বলের মতো লুফে আনে এবং পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে দেয়। বাস্তবের সত্তা নিয়ে শেষপর্যন্ত যার সম্পর্কে কবির অভিজ্ঞতা -

" একবার তাকে দেখা যায়,
একবার হারিয়ে যায় কোথায়।" [২৭]
('বিড়াল' :' মহাপৃথিবী')

এই বিড়াল সারাক্ষণ কিছু পাওয়ার লোভে বা প্রত্যাশায় ঘোরাফেরা করে। রোদে, ছায়ায়, প্রকাশ্যে, গোপনে সে সব জায়গায় ঘোরাফেরা করে। খুব বেশি চাওয়া তার নেই। 'কয়েক টুকরো মাছের কাঁটার সফলতার পর' বিড়াল তৃপ্ত। তাঁর "১৯৪৬-৪৭" কবিতায় জীবনের ইতর শ্রেণির মানুষের যে বিবরণ আছে তারা বাজারে পোকাকাটা জিনিসের দরদাম করে। বিড়াল ভগ্যবান এইজন্যই, সে সামান্য হলেও কিছু পেয়েছে। এরপরেই কবির দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। বিড়ালও রূপান্তরিত হয়। মাছের কাঁটার সফলতা নিয়ে সে আপাত সুখে মৌমাছির মতো নিমগ্ন হয়ে থাকতে থাকতে সহসা জেগে ওঠে। ফুল থেকে মধু সংগ্রহ ও মৌচাক বানানো মৌমাছির কাছে।বিড়াল ভিক্ষুক বা প্রার্থী হতে চায় না। নিজস্ব শক্তিতে সে নিজেকে বিকশিত করতে চায়। তাই সমস্ত মগ্নতা ঝেড়ে ফেলে ক্রোধে, আক্রোশে কৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ আঁচড়ায়। এখানে 'আঁচড়ায়' শব্দের মধ্য দিয়ে বিড়ালের হিংস্রতাকে প্রকাশ করছে। কিন্তু কৃষ্ণচূড়া গাছ কেনো? লাল ফুলে ভরা কৃষ্ণচূড়া প্রেমের প্রতীক। তার রক্তবর্ণে আছে যৌবনের উন্মাদনা। অথচ বিড়াল সেই প্রেমের নাগাল পায় না। খাদ্য ও উদরপূর্তি ছাড়া তার আর কোনো সাধ নেই। অথচ যারা না চাইতেই সব পায়, তারাই প্রেমবিলাসী। সেই বিলাসীকৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ বসিয়ে বিড়াল তার বিফলতাকে প্রকাশ করে আঁচড়ের দাগে। তারপর সারাদিন সে সূর্যের পেছনে পেছনে চলেছে। এখানে সূর্য শুধু শক্তির বা তাপের উৎস নয়। কবি জীবনানন্দের কাব্যে সূর্য চেতনার ও বোধের প্রতীকও। হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীরে সে থাবা বুলায়। সূর্য নয়, সূর্যের ছায়াকে নিয়ে সে প্রাপ্তির আনন্দে খেলা করে। বিড়াল যে মুহূর্তে জানে, তার জন্য কোনো সূর্য নেই, তখনই সে ফিরে যায় যায় আদিমতার অন্ধকারে।

" তারপর অন্ধকারকে ছোটো ছোটো বলের মতো থাবা
দিয়ে লুফে আনল সে,
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিলো।" [২৮]

(' বিড়াল' :'মহাপৃথিবী')

ব্যর্থ, বঞ্চিত মানুষ মাত্রই প্রতিশোধ পরায়ণ। বিড়ালও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই নিজে যে আলো থেকে সে বঞ্চিত অন্যদের সে সেই আলোর মুখ দেখতে দিতে চায় না। তাই রাশি রাশি অন্ধকার সে ছড়িয়ে দেয়। ঈর্ষাকাতর, হীনচেতা মানুষেরা যেমন 'বসন্তের কোকিল', তেমনি 'বিড়াল' ও হতে পারে। কবি তেমনই বিড়ালের দেখা পান বারবার, ঘুরে ফিরে।

৪. হাওয়ার রাত

'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের একটি অন্যতম কবিতা হলো 'হাওয়ার রাত' ।রাত্রি কিংবা অন্ধকার জীবনানন্দের কাব্যে সর্বদা স্বস্তিদায়ক নয়। 'হাওয়ার রাত' কবিতা জাগরণের কবিতা। যেখানে কবির অভিজ্ঞতা - 'কাল এখন চমৎকার রাত ছিলো'। এমন আনন্দময় রাত আর নিদ্রাহীন রাত বোধহয় কবির জীবনে কমই এসেছে। বলা প্রায় অসম্ভব ঠিক কোন অনুভব থেকে কবি এমন রাত কাটালেন। যেখানে মৃত্যুমাখা অন্ধকার নেই, আছে শুধু মুগ্ধতা, উল্লাস আর জীবনের জয় ও আনন্দের অভিজ্ঞতা।

'হাওয়ার রাত' কবিতায় নিদ্রাহীন বিগত এক রাতেরস্মৃতিচারণা করেছেন কবি। সে রাতে আকাশ ছিলো নক্ষত্রখচিত, খই ছড়ানো জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছিলো আশপাশ। বিগত রাত্রির আনন্দঘন অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে কবি বলেছেন -

"গভীর হাওয়ার রাত ছিলো কাল - অসংখ্য নক্ষত্রের রাত,
সারারাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলছে,
মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো,
কখনো বিছানা ছিঁড়ে
নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে,"[২৯]

(' হাওয়ার রাত':' মহাপৃথিবী')

সময়ের অন্ধকারকে অতিক্রম করে আলোকময় প্রেমোজ্জ্বল সময় ফিরে পেতে চেয়েছেন। দূরতর হয়ে যাওয়া প্রেম মৃত্তিকাজাত ঘাসের মতো প্রাকৃতিক মিলনের ঠান্ডা ছোঁয়ায় নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে। 'হাওয়ার রাত' এবং 'নক্ষত্রের রাত' এই যুগ্ম বিশেষণে কবি রাতের স্নিগ্ধতা, গতি ও ঐশ্বর্যের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। আসলে হাওয়ার মধ্যে যে প্রাণসত্তা, আবেগ ও গতি আছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ফুলে ওঠা মশারির চিত্রে-

'মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো' উপমায় বিস্তার পেয়ে যায়। বর্ষার সমুদ্রে স্ফীত রূপ শুধু নয়, উত্তাল ফেনিল রূপ এখানে দেখা যায়। মশারি এখানে কবির কাছে প্রতিবন্ধকতার প্রতীক, যার জন্য তিনি দূরে অসীমে যেতে পারেন না। কিন্তু সেই স্থির, বদ্ধ মশারিও হাওয়ার রাতে গতি পায়।

কবির মনে হয় প্রবল হাওয়া তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে, নীল হাওয়ার সমুদ্রে সাদা বকের মতো উড়ছে সে। মশারিকে নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে দিতে চেয়েছেন কবি। তিনি নিজেও নক্ষত্র অভিসারী। তাঁর রাতের আকাশ মৃত নয়, নিষ্প্রদীপ নয়, বরং আলোকাভিসারী কবির কাছে নক্ষত্রেরা হয়ে উঠেছে কবির আপনজন, মৃত নক্ষত্রেরাও প্রাণ ফিরে পেয়েছে। এক আকাশ তারা আর হাওয়া ভরা রাতে পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখ নক্ষত্রের ভিতর দেখেছেন কবি। কবিত্ব শক্তির নৈপুণ্যে একটি লোকবিশ্বাসকে মিলিয়েছেন কবি। সেখানে নক্ষত্রও তাঁর প্রিয়জন। তাঁদের উজ্জ্বলতা' প্রেমিক চিল পুরুষের শিশির ভেজা চোখের মতো' 'হায় চিল' কবিতায় দেখলাম, পেয়ে হারানোর বেদনায় সোনালী ডানার চিল হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগায়। সুদূরের নক্ষত্রেরা কি রাঙা রাজকন্যার মতো রূপ নিয়ে সরে থাকে?

তাই প্রেমিক চিল পুরুষের সজল চোখের কথা বলেন কবি? মৃত নক্ষত্রেরা কবির কাছে হয়ে উঠেছে রূপসী নারী -

" যে-রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতিদূর আকাশের সীমানার কুয়াশায় কুয়াশায় দীর্ঘ বর্ষা
হাতে ক'রে
কাতারে-কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন ---"[৩০]

(' হাওয়ার রাত':' মহাপৃথিবী ')

প্রত্নমহিমার আলো আঁধারে মাখা নারীরা নক্ষত্র হয়ে কবির মনে প্রশ্ন সৃষ্টি করে, এমন রাতে কেন তারা আসে?

" মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য?
জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য?
প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য?"[৩১]

(' হাওয়ার রাত':' মহাপৃথিবী')

এসবই প্রেমের বিচিত্র কর্মরূপ। প্রেম যখন ছিঁড়ে ফেঁড়ে যায়, তখন ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ সৃষ্টি হয়। কিন্তু যথার্থ প্রেমে জীবনের জয় ঘোষিত হয়। তাই হাওয়ার রাতে নক্ষত্রের জাগরণ কবির প্রেম ও হৃদয়ের ও জাগরণ। তখন রাতের আকাশ ' বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের ওপর উজ্জ্বল চামড়ার শালের মতো জ্বলজ্বল করছিলো' দেখা যায়। কবি তাই বললেন -

" কাল এমন আশ্চর্য রাত ছিলো।" [৩২]

('হাওয়ার রাত' :' মহাপৃথিবী')

এমন ঐশ্বর্যময় রাতে অভিভূত না হয়ে কি থাকা যায়? কবি এমন ঐশ্বর্যময় রাতে অভিভূত হয়ে জানান -

" কাল রাতে প্রবল নীল অত্যাচারে আমাকে ছিঁড়ে
ফেলেছে যেন," [৩৩]

('হাওয়ার রাত' : ' মহাপৃথিবী')

এ অত্যাচার দুঃখের নয়, ভালোবাসার। এই উপলব্ধি কত গভীর ও প্রগাঢ় তা বোঝা যায়, কবি যখন বলেন -

" আকাশে বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানার ভিতর
পৃথিবী কীটের মতো মুছে গিয়েছে কাল," [৩৪]

('হাওয়ার রাত ':' মহাপৃথিবী')

এখানে আকাশ মৃত চিতার চামড়া নয়, বহুমূল্য বস্তু নয়, তা এখন সজীব, চঞ্চল।আকাশ, রাত, কবিপ্রাণ সবই আজ গতিরাগের গানে উদ্দীপ্ত। অন্তহীন চলার আনন্দে, ছন্দে উত্তুঙ্গ বাতাস নেমে আসে। জানিয়ে দেয়, মশারিও চারদেওয়ালের গণ্ডি থেকে, শুধু প্রাণ ধারণের, দিন যাপনের গ্লানি থেকে মুক্তির বার্তা বয়ে আনে রাতের হাওয়া। এক অদ্ভূত উপমায় কবি সেই মুক্তির ছবি আঁকেন -

" সিংহের হুঙ্কারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো।" [৩৫]

(' হাওয়ার রাত' :' মহাপৃথিবী')

প্রাণভয়ে সিংহ বা মৃত্যুর হাত থেকে জেব্রার ছুটে চলা, হাওয়ার রাতে কবির জেগে ওঠা, নক্ষত্র সুন্দরীদের সঙ্গ পাওয়া জীবনের গভীর জয়কেই ইঙ্গিত করেছে।

কবিতায় শেষ দুটি স্তবকে ইন্দ্রিয়াতুর এক কবিকে পাই।যিনি এক রাত্রির অভিঘাতে জীবনের আস্বাদে আপ্লুত।কবি তাঁর সেই মুগ্ধতা, মত্ততাকে প্রকাশ করে বলেছেন -

" হৃদয় ভরে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে
দিগন্ত প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে," [৩৬]

('হাওয়ার রাত' :'মহাপৃথিবী')

সবুজ ঘাস এবং তার গন্ধ হল প্রাণের যৌবনের প্রতীক। কবি কেবল দেহের স্বাদ ও আমিষ গন্ধে আবদ্ধ থাকতে চান নি, তাই তাঁর হৃদয় ছিঁড়ে উড়ে যায় ' নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো' কখনো বা দূর নক্ষত্রভিসারী হৃদয়কে মনে হয় উড়ে চলা ' একটা দুরন্ত শকুনের মতো'। শকুন এখানে নিঃসঙ্গ, ব্রাত্য এক শক্তিশালী গতিচঞ্চল পাখি। তারায় তারায় নিঃসীম শূন্যে যার সঙ্গে কবিচিত্ত উড়ে যায়।

৫. নগ্ন নির্জন হাত

' নগ্ন নির্জন হাত' কবিতাটি ' মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত অন্যতম একটি কবিতা। কবিতাটি কবির অতীত পরিক্রমার বাঙ্ময় রূপ। কবি সেই রাজ্যে পৌঁছোবার পথটি বর্ণনা করেছেন। অতীত যখন মুখ ফেরায় তখন তার সামনে ইতিহাসের ঘটে যাওয়া আলোড়নের অবকাশকে ছোঁয়া যায়। বিগত কালের জীবন স্রোতের নানা সংকেতের দিশা পেয়ে একটা বিচ্ছেদের বেদনাময় সৌন্দর্যের স্বাদ অনুভব করেন কবি।

ফাল্গুনী বসন্ত রাতের বর্ণনা দিয়ে কবিতাটি শুরু হয়েছে। রাতের আকাশ যখন ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন -

" আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে,
আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার।" [৩৭]

(' নগ্ন নির্জন হাত' :' মহাপৃথিবী')

কবির মতে এ আঁধার সম্পূর্ন নেতিবাচক নয় আলোর স্পষ্টতা ও দীপ্তির সাযুজ্যযুক্তা আলো-আঁধার জন্মগত উৎসের বিচারে এক তারা সহোদরা বোন। সুতরাং, এই আঁধারের গর্ভে শুধু নৈরাশ্য নয়, আছে আশার ইঙ্গিত। বসন্ত রাতে প্রাণ ও প্রেমের বর্ণময় উচ্ছাস স্বাভাবিক। আলোর সহোদরা অন্ধকারে, মন ফিরে গেছে তার গভীরতার দিকে। সেখানে ধূসরতায় জেগে উঠেছে ইতিহাসের বিলুপ্ত এক প্রাসাদের ছবি, কবির অন্তরে।

এই নগরী আর আর তার প্রাসাদ কোন দেশের তা জানা নেই। কোনো এক প্রত্নধূসর সভ্যতার অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে তার উপাদান। একটা রহস্যের জাল দিয়ে ঘেরা থাকে তার অস্তিত্ব, প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা নগরীর কোনো প্রাসাদ জেগে ওঠে মনে। সুপ্রাচীন সভ্যতার হদিশ পাওয়া গেছে ভারত মহাসাগর, ভূমধ্যসাগর ও টায়ার সিন্ধুর তীরে। কবির মনে সেইসব স্থানে নগরীতে প্রাসাদ বিলুপ্ত হয়েছে কালের গর্ভে। সেই অতীত কালেও কবির জীবন্ত অস্তিত্ব অনুমান করা যায় - হৃদয়, চোখ ও স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা সবই কোনো শূন্যে বিলীন হয়ে গেছে। সেই বিপুল সত্ত্বার মতো যখন সবই জীবন্ত ছিল তখন নারীও পাশে ছিল, এইসব নিয়ে জীবন ছিল সতেজ ও সম্পূর্ন।

কবি সেই বিলুপ্ত নগরীর বিস্তৃত প্রাসাদের ভিতরে ঢুকে গেছেন। তাঁর ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের রাজকীয় সমারোহের বর্ণনা দিয়েছেন-

" মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ
পারস্য গালিচা, কাশ্মীরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল
মুক্তা প্রবাল,
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন
স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা,
আর তুমি নারী _____" ৩৮

(' নগ্ন নির্জন হাত' :' জীবনানন্দের কবিতার শরীর')

পারস্য কাশ্মীর, বেরিং উপসাগর প্রভৃতি স্থান থেকে গালচে, শাল, মুক্তা-প্রবাল প্রভৃতি মহার্ঘ্য উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে। সেই প্রেতপুরীতে স্মৃতি এনেছে বস্তুসম্ভারের উত্তাপ। তারই মধ্যে সূক্ষ্ম কাজের কারিকুরি। গালচে-শাল-মুক্তা-প্রবালের স্তূপীকৃত সম্ভারের মধ্যে পড়ে আছে কবির ' বিলুপ্ত হৃদয়', পড়ে আছে কবির ' মৃত চোখ' আর তার মধ্যে রয়েছে কবির বিলীন স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা। অতীত সৌন্দর্য স্বপ্ন নিবিড় হয়ে উঠেছিলো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যায়, লুপ্ত হয় এইসব চিত্রকল্পনার সহযোগ। মৃত চোখ, বিলুপ্ত হৃদয়, স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার মাঝে রয়েছে সেই নারী যে কবিকে চিরদিন ভালোবেসেছে, এবং যার মুখ কবি কোনোদিন দেখেননি। সেই নারীকে কবি তুমি বলে সম্বোধন করেছেন।

ইতিহাসের বিবর্তনে মিলিয়ে গেলেও আঁধারে জেগে ওঠা অন্তরের আলোয় তারা মুক্ত হয়েছেন। সে যুগেও জীবনের তাপ এবং আলোর বসতি ছিল না ---

" অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল,
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিল,
মেহগনির ছায়াঘন পল্লব ছিলো অনেক,"[৩৯]
(' নগ্ন নির্জন হাত' :' মহাপৃথিবী')

কবির সেই অতীত চারিতায় গত জীবনের মৃদু উত্তাপ প্রাণের স্পন্দনে শান্তির বাতাবরণ আর সবুজের সমারোহে স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্নতা ছিল। কমলা রঙের রোদ প্রসঙ্গে প্রিয় নারীর অস্তিত্ব সঙ্গও ছিল তাই কেবল উচ্চারিত হয় -

" তোমার মুখের রূপ কতো শত শতাব্দী আমি দেখি না,
খুঁজি না।"[৪০]
(' নগ্ন নির্জন হাত' :' মহাপৃথিবী')

যাতে প্রাণের সংরাগ কমলা রঙের রোদের প্রতিক্রিয়ার মতো ঈষৎ উষ্ণ স্পর্শ বয়ে আনে। আগের স্তবকে কবি ' তুমি নারী' বলে, অপূর্ণ বাক্যের মধ্যেই তার সম্ভাষণকে থামিয়ে দিয়েছিলেন। এবার কথা সম্পূর্ণ করলেন। কবি তার মুখের রূপ শত শত বৎসর ধরে

দেখেননি, আজও দেখছেন না-খোঁজেনও না। কোনোদিন খোঁজেননি। শতাব্দীর পর শতাব্দী এদের বন্ধন-নারী নারী তাকে ভালোবাসে, সে নারীকে দেখেনি, খোঁজে না। কে এ নারী? এ কি রকম প্রেম?

পরবর্তী অংশে কবি তাকে মনে স্থাপন করেন রূপ-রস-গন্ধের স্পর্শের পূর্ণতায়। অবয়ব নিয়ে ইতিহাস এসে উপস্থিত হয় ব্যক্তির পঞ্চেন্দ্রীয়ের সীমায়-

" ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী,
অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা।"[৪১]

(' নগ্ন নির্জন হাত' : ' মহাপৃথিবী')

সেকালের উপযোগী স্থাপত্য ভাস্কর্য্যের কারিগরি শোভা ধরা পড়েছে আলোচ্য অংশে। তার বাতাসে থাকে লুপ্ত নাসপাতির গন্ধ মৃগ ও মৃগরাজ্যের চর্ম বর্ণময় কাঁচের জানালা, ' ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায় পর্দায়' বৃহৎ প্রাসাদের গৃহসজ্জার মিলে ধরা পড়ে অভিজাত অট্টালিকার নিটোল অবয়বে ঘরোয়া উপকরণ সম্ভার।

এই কবিতায় সেই নারী কল্পযুগের সম্ভাবিতা সহচরী রূপে প্রায় বিদেহী অস্তিত্বের মতো অনুভবগোম্যা। প্রাসাদের গালিচায় ও পর্দায় রোদের বিচ্ছুরণে ধর্ম সঞ্চার, লাল পান পাত্রে স্বপ্ন সঙ্গীনী ধরে দিয়েছে রঙিন মদ -

" পর্দায় গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ!
তোমার নগ্ন নির্জন হাত।"[৪২]

(' নগ্ন নির্জন হাত' :'মহাপৃথিবী')

রক্তাভ রৌদ্রের রঙে তীব্র কামনা এবং গালচেতে পর্দায় বিচ্ছুরিত দেহ বাসনার মিশ্রণ। পাওয়া না - পাওয়া, থাকা - না - থাকা সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য অনুভবের স্বাক্ষর ঐ হাতে যা নগ্ন আর নির্জন। কবিতাটি পড়তে পড়তে অনায়াসে আমরা দেখতে পাই কমলা

রঙের রোদ, রামধনু রঙের কাঁচের জানালা, রক্তাভ রৌদ্রের তাপ, লুপ্ত নাসপাতির গন্ধ ভেসে আসে নাকে। কিন্তু এসব ছাপিয়েও দেখা যায় ' অপরূপ খিলান' ও ' গম্বুজের বেদনাময় রেখা' এবং একটি ' নগ্ন নির্জন হাত' ।যে হাতে আছে অনেক রহস্য ও বিস্ময়। যে হাতে আছে কবির ' বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা'। ঐ হাত তার নগ্নতায় সৃষ্টি করে মদির-মধুর কামনায় উত্তাপ ও আহ্বান, আবার নির্জনতা এসে জানায় তার বেদনা, বিষাদ ও একাকীত্ব। ধূসর প্রাসাদের আয়ুহীন স্তব্ধতায় বিস্ময় ঐ নগ্ন নির্জন হাত, যা রঙের স্রোত রসের মূর্তির ক্ষণিক আভাস।

৬. শিকার

বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদিত কবিতা পত্রিকার ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় ' শিকার' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়।এরপর ১৩৫১ বঙ্গাব্দে ' মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়। জীবনানন্দ দাশ এমন একজন কবি, যাঁর কলমের ছোঁয়ায় তৈরি হয় অপরূপ চিত্রকল্প। কবির লেখা ' শিকার' কবিতাটিও তার ব্যতিক্রম নয়। কবিতার সূচনাই হয়েছে এক ভোরের বর্ণনা দিয়ে।

আমিষাশী মানুষের হৃদয় জুড়ে যে আঁশটে গন্ধ তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ' শিকার' কবিতায়। প্রসন্ন এক ভোরবেলায় আকাশ যেখানে নীল হয়ে ছড়িয়ে আছে। শুধু বনের সবুজে লেগে আছে কিছু রক্ত নিরীহ হরিণের মৃত্যুর দাগ। এই মৃত্যুই ম্লান উৎসব হয়ে ফুটে উঠেছে ' শিকার' কবিতায়।

ভোরের পটভূমিতে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন কবিতায়। দেশোয়ালিদের শরীরকে গরম রাখার জন্য জ্বালানো আগুন ভোরে জ্বলতে থাকলেও রাতের বেলার লাল উজ্জলতা হারিয়ে তা বিবর্ণ হয়ে যায়। ভোরের মহিমা ও প্রশান্তির বর্ণনায় নীল ও সবুজ দু-রঙের বিন্যাসে ও বিরোধে প্রাণ ও মৃত্যুর আভাস লেগে থাকে সকলের গায়ে। আকাশ এখানে উপমিত হয়েছে ঘাস ফড়িং এর দেহের বর্ণনার সাথে। যে ঘাস ফড়িং ও

ক্ষণজীবি তবু আছে প্রাণের সবুজ উচ্ছ্বাস যা প্রেম হয়ে ফুটে উঠেছে গোধূলি বেলার তারা হয়ে।

আমরা দেখি কবির চোখে অনুভবে-----

" পাড়াগাঁর বাসর ঘরে গোধূলি-মদির মেয়েটির মতো,
কিংবা মিশরের মানুষী তার বুকের থেকে যে-মুক্তা আমার
নীল মদের গেলাসে রেখেছিলো।" [৪৩]

(' শিকার' : ' মহাপৃথিবী')

এই তারা সেই নারীর মতো কবিকে প্রলুব্ধ করে, ছিঁড়ে ফেড়ে দেয়।

দেশোয়ালীদের আগুন যা হিমের রাতে শরীর উম্ ধরাবার জন্য জ্বালানো হয়েছে সে আগুন, যে আগুনে শরীর কামনা-লালসায় উষ্ণতর হয়ে ওঠে যে উষ্ণতা প্রকৃতিকে বিবর্ণ করে দেয় ---

" সূর্যের আলোয় তার রঙ কুঙ্কুমের মতো নেই আর
হয়ে গেছে রোগা শালিকের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।" [৪৪]

(' শিকার' :' মহাপৃথিবী')

এক বিমূর্ত উপমায় প্রকৃতির বিষণ্ণতা ফুটে উঠেছে এখানে।

প্রথম এবং চতুর্থ স্তবকে একটি শব্দে একটি পঙক্তি পাই। দ্বিতীয়বার
'ভোর' শব্দে না আছে প্রসন্নতা না আছে প্রশান্তি বরং এক প্রাণের আত্মরক্ষার শোচনীয় ছবি আঁকা হয় বাদামী এক হরিণকে দেখি----

" সারারাত চিতা বাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে" [৪৫]

(' শিকার' :' মহাপৃথিবী')

যে ভোরের জন্য সে অপেক্ষা করছে সে জানে দিনের আলোয় বাঘিনী আত্মগোপন করবে তাই বেঁচে যাওয়ার আনন্দে হরিণ ভোরের আলো মেখে - - -

" কচি বাতাবীর মতো সবুজ সুগন্ধি ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে।"[৪৬]

(' শিকার' :'মহাপৃথিবী')

সুগন্ধি ঘাস ছিঁড়ে খাওয়ার মধ্যেই প্রাণের উল্লাস ও আস্বাদকে বোঝা যায় এরপর নতুন জীবন পেয়ে তার আনন্দে - - -

" নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে নামল সে"[৪৭]

(' শিকার' :' মহাপৃথিবী')

তারপর মুক্তি আর স্বপ্ন স্নান সিক্ত দেহ সূর্যের সোনার বর্শার মতো ঝলমল করে ওঠে যা দেখে চমকিত হয় সকলে।

হিংস্র প্রাণীর নখ, দাঁতের আঁচড় এড়িয়ে যে হরিণ উল্লসিত সে বুঝতেই পারে না অরণ্যের পরেও আছে জনারণ্য। যেখানে মানুষ শুধু জন্তুমাত্র নয় শিকারীও। তখন মৃত হরিণের মাংসে জঠর তৃপ্তি খোঁজে, নক্ষত্রের নীচে ঘাসে ম্লান হতে থাকে পুরোনো শিশির ভেজা গল্প। প্রকৃতি থেকে মানুষের বিচ্যুতি ঘটে, নাগরিকতা গ্রাস করে অরণ্যমায়া। থাকে শুধু - - -

" সিগারেটের ধোঁয়া,
টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা
এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক - হিম - নিস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।"[৪৮]

(' শিকার' :' মহাপৃথিবী')

বনের হরিণকে অকারণে যারা মৃত্যুমুখে আচ্ছন্ন করলো এখন তারাই ভোজন তৃপ্ত ও ঘুমন্ত। সত্যিই কি এই ঘুম নিরপরাধ?

' মহাপৃথিবী ' : একালের পাঠকের চোখে

বিশ শতকের জটিল মনের আশ্চর্য প্রতীক জীবনানন্দ দাশ। তাঁর 'মহাপৃথিবী' র কবিতাগুলো ১৩৪৫-৪৮ এর ভেতরে লেখা হয়েছিলো এবং আমরা দেখি এই 'মহাপৃথিবী'র কবিতায় পাঠক নতুনত্বের স্বাদ পেয়ে থাকে। এখানে কবি ইতিহাস ও সময়ের বুকে হাত রেখে হেমন্তের কুয়াশার ভেতর দিয়ে এক অদেখা জগতে পাড়ি দিয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথের সময়ে জীবনানন্দ একটা নিজস্ব জগত সৃষ্টি করতে পেরেছেন। জীবনানন্দের কবিতায় যে অন্তরের বোধ তাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়না পাঠকের পক্ষে। ' মহাপৃথিবী' কাব্যে আমরা ইতিহাস চেতনা, ভৌগোলিক চেতনা, সমকালীন সময়ের জীবনবোধ সবই পেয়ে যাই। মৃত্যু ভাবনায় কখনও তিনি আক্রান্ত হয়েছেন।

' মহাপৃথিবী ' কাব্যের অন্তর্গত 'আট বছর আগের একদিন' একটি বিখ্যাত কবিতা। কবিতাটি পাঠ করার মধ্য দিয়ে পাঠকের মনে বিস্ময় জাগে, অন্তরের অবচেতন সত্তা আলোকিত হয়। কবিতাটির নামকরণের মধ্যেই একটা গল্পের আভাস পাওয়া যায়। গল্পটা শুরু থেকে শেষ হয়েছে একেবারে নাটকীয়ভাবে, একজন নামহীন ব্যক্তির আত্মহননের পথ বেছে নিয়ে লাশকাটা ঘরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। আত্মহত্যা, লোকটির জীবন ব্যর্থ নয়, তার জীবনে প্রেম, আশা, বধূ, সন্তান সবকিছুই ছিল, তাও তাকে রক্তফেনা মাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজে অন্ধকারে মরতে হলো। অন্যদিকে এই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ফাল্গুনের রাতের মধ্যে দিয়ে চমৎকার বৈপরীত্য ধরা পড়েছে । কারণ, ফাল্গুন যৌবনের প্রতীক, পূর্ণতার প্রতীক।

হয়তো লোকটির হৃদয়ে এমন ব্যথা ছিলো যা আমরা জানি না, হয়তো বা লোকটির জীবনে প্রেম ও আশা একাকীত্বের বিপন্নতা সৃষ্টি করেছিল, তাই অদ্ভুত আঁধারে উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে তাকে তার দুঃখ লাঘবের কাহিনী শুনিয়েছিল।

প্রকৃতির সব উপাদান - অশ্বত্থের শাখা, জোনাকির ভিড়, যবের ঘ্রাণ, হেমন্তের বিকেল - এই সবই যুবকটিকে আত্মহননের প্রতিবাদ জানিয়েছিল। সবকিছু উপেক্ষা করে লোকটি মৃত্যুকে বরণ করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্করতা কবিকে নশ্বরতা বোধে দীক্ষিত করেছে। জীবনের ক্লান্তি, হতাশা সবই ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পেয়ে যাই।

অন্যদিকে 'বিড়াল' কবিতার মধ্যে দেখা যায় একটি বিড়ালকে, যে সারাক্ষণ কিছু পাওয়ার লোভে ঘোরাফেরা করে । রোদে, ছায়ায়, গোপনে, কখনও বা প্রকাশ্যে, সব জায়গায় তাকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় । তার খুব বেশি চাওয়া নেই। কয়েক টুকরো মাছের কাঁটা পাওয়ার পরেই বিড়াল তৃপ্ত। পৃথিবীতে এখনও অনেক এরকম মানুষ আছে যাদের দিনের পর দিন অনাহারে কাটছে । সেদিক থেকে দেখতে গেলে বিড়াল ভাগ্যবান, কারণ সে সামান্য কিছু হলেও পেয়েছে।

ঠিক এরপরই কবির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। বিড়াল রূপান্তরিত হয়। কয়েক টুকরো মাছের কাঁটা পাওয়ার সুখে যে বিড়াল মৌমাছির মতো নিমগ্ন ছিলো, সেই বিড়াল হঠাৎ করেই জেগে ওঠে। বিড়াল ভিক্ষুক হতে চায়নি, সে নিজের শক্তিতে নিজেকে বিকশিত করতে চেয়েছে।

জীবনানন্দের এই যে 'মহাপৃথিবী' র জগৎ, সেখানে কবির স্বকীয়তা আমাদের মুগ্ধ করে, বিস্মিত করে। যেন এক নতুন জগতের সন্ধান দেয়। তাঁর কবিতার মধ্যে যে স্বচ্ছন্দ বিচরণ, ইতিহাসের বুকে দাঁড়িয়ে গভীর মনের মধ্যে সময়কে তুলে ধরা, সময়কে নতুন ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত করা তা কেবল বাংলা কবিতায় জীবনানন্দের মধ্যে পেয়েছি।

আমরা ' হায় চিল ' কবিতাটির মধ্যে দেখেছি পেয়ে হারানোর বেদনায় সোনালী ডানার চিল হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগায়। কবিতাটির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে তিরিশের দশকের সন্দেহ, গ্লানি কিভাবে মানুষকে গ্রাস করেছে। চিলের মধ্য দিয়ে অসহায় মানুষের

আর্তনাদ প্রতিফলন হয়েছে। চিল জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত এক পথিক। পাঠকবর্গকে যেন এক মেঘলা দিনের বিষণ্ণতায় প্রেমের বিরহের স্রোত পাঠ করিয়েছেন কবি। ভিজে মেঘের দুপুরে একটি চিলকে উড়ে যেতে দেখা যায়। যার উড়ে চলার মধ্যে কান্না ঝরে পড়ে। তাঁর বিরহ ও শূন্যতা বোধের কারণ পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো কবির মানসী রূপ নিয়ে দূরে চলে গেছে। আজ তার অনুপস্থিতি বড় বেদনাময়।

যেখানে অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিল পুরুষের শিশির ভেজা চোখের মতো, তাকে আমরা ভুলতে পারি না, তাই এখানে একালের পাঠককে জীবনানন্দের 'মহাপৃথিবী' কাব্যে এক মহা বিস্ময়ে, ইতিহাস আর সময়ের দিকে তাকিয়ে থেকে এক বোধ ও বোধির গভীর দ্যোতনায় বিস্মিত হতে হয়।

উপসংহার

বাংলা কবিতায় আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছিলো বিশ শতকের তিরিশের দশকে। এই আধুনিকতার সেতু যাঁরা নির্মাণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম আধুনিক বাঙালি কবি হলেন কবি জীবনানন্দ দাশ ।সমকাল ও প্রকৃতির ব্যতিক্রমী সাহচর্য জীবনানন্দকে বাংলা কাব্যের জগতে ভিন্ন পথের যাত্রী করে তুলেছিল। তাঁর কবিতাতে ইতিহাস চেতনা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নারকীয়তা ও বিভৎসতা, অতি তুচ্ছ স্বার্থ নিয়ে মানুষের মধ্যে হানাহানি কবির মধ্যে সংশয় জাগিয়ে তুলেছে। বিশ্বযুদ্ধের হতাশা, নৈরাশ্য, বিচ্ছেদ, সংশয়, মানসিক দ্বন্দ্ব ও জীবন অবক্ষয়ের কথা স্থান পেয়েছে তাঁর কাব্যে।' মহাপৃথিবী' কাব্যে পূর্বের বিষণ্ণতা ইতিহাস চেতনার সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে ঠিকই তবে সেই সঙ্গে নতুন ভাবনা ও ফুটে উঠেছে। ' হাওয়ার রাত', ' নগ্ন নির্জন হাত' প্রভৃতি কবিতায় ইতিহাস চেতনা ও কালচেতনা হাত ধরাধরি করে এসেছে। ' বনলতা সেন' কাব্যে কবির ইতিহাস চেতনা পেয়েছে এক পরিপূর্ণ রূপ। প্রাচীনের প্রেক্ষাপটে বর্তমানের রূপ দেখে ভবিষ্যতের ছবি রচনা সম্ভব হয়েছে। কবি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের শুনিয়েছেন -

" সব পাখি ঘরে আসে-সব নদী-ফুরায় এ-জীবনের লেনদেন।
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।"[৪৯]

(' বনলতা সেন' : ' বনলতা সেন')

এই উচ্চারণের পর জীবনের আর কোন আলোড়নই বাকি থাকে না। ইতিহাস চেতনা, কাল চেতনা এবং তার পাশেই এসেছে জীবনানন্দের প্রেম ভাবনার স্বাতন্ত্র। যুগের আঘাতে কবির মন বিক্ষিপ্ত হয়েছে। প্রেম সৌন্দর্য এবং জীবন জিজ্ঞাসাও ধূসরপ্রায়। এক গভীর শূন্যতাবোধের যান্ত্রিকতা ও হৃদয়হীনতার বেদনাই কবির মনে মৃত্যু ভাবনার জন্ম দিয়েছে। ' আট বছর আগের একদিন' কবিতায় কবির নিজের মনে সংশয় জেগেছে। তিনি কেনো মৃত্যু খুঁজছেন? কোথায় শান্তি পাবেন? যে মানুষটি আত্মহত্যা করেছে, একজন সাধারণ মানুষ যা যা চায় সে সবই পেয়েছে তাও লোকটি আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। হাড়হাভাতের গ্লানি তার জীবনকে কখনও বিপর্যস্ত করেনি। তার পাশেই শুয়ে ছিল বধূ এবং শিশু। তবুও সে আজ মর্গে। গুমোটে থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে ঘুমোচ্ছে। কেন লোকটার বেঁচে থাকাটা অসহ্য মনে হয়েছিল? যার জন্য তার মরিবার সাধ হলো। আসলে এই পৃথিবী যখন শত শত শূকরীর প্রসব বেদনায় আর্ত, যে ইচ্ছাগুলোকে সে জাগতিক পাওনা দিয়ে পূরণ করতে পারেনি, তখনই

মৃত্যু দিয়ে জীবনের অপূর্ণতা পূর্ণ করার ব্যতিক্রমী প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় মানুষটির মধ্যে, লোকটি লাশকাটা ঘরে চলে যায়। পাশাপাশি মৃত্যুভাবনা ও জীবনভাবনা কবিতায় অসামান্য এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। ফাল্গুনের চাঁদের আলোর পরে চাঁদ ডোবা গাঢ় অন্ধকারে যারা জীবনের ভোগ সুখে মেতে ওঠে, তারাও বুঝতে পারে না এমন মৃত্যুর মানে কী? কবিতার মানুষটি ব্যতিক্রম তাই তাকে চলে যেতে হলো। বেঁচে থাকা বা টিকে থাকার মধ্যে জীবনের প্রকৃত আনন্দময় সমাধান সূত্র যাঁরা খুঁজে পান না তারা আরও একটা আলোকিত প্রভাতের একান্ত কামনায় নিস্তবদ্ধতার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তাই মৃত্যু কখনও কখনও পরিত্রাতা হয়েছে। অন্যদিকে 'হাওয়ার রাত' কবিতাটির মধ্য দিয়ে কবি রাতের স্নিগ্ধতা, গতি ও ঐশ্বর্যকে ইঙ্গিত করেছেন। হাওয়ার মধ্যে যে প্রাণসত্তা, আবেগ ও গতি আছে তা ব্যক্ত করেছেন ফুলে ওঠা মশারির ছবিতে। মশারি কবির কাছে প্রতিবন্ধকতার প্রতীক। যার জন্য তিনি অসীমে যেতে পারেন না। সেই স্থির, বদ্ধ মশারিও হাওয়ার রাতে গতি পায়। বকের উপমায় গতির ইঙ্গিত এবং সমুদ্র শব্দে বিস্তার, দুরত্ব ও বিশালতাকে ব্যঞ্জিত করেছেন। মশারিকে নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে দিয়েছেন কবি। কবি নিজেই নক্ষত্র অভিসারী। তাঁর রাতের আকাশ মৃত নয়, নিষ্প্রদীপ নয়। বরং সেই রাতে মৃত নক্ষত্রেরা সবাই জেগে উঠেছিল। এক আকাশ তারা আর হাওয়া ভরা রাতে পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছেন কবি। জনশ্রুতি ও বিশ্বাস: মানুষ মারা গেলে নক্ষত্র হয়ে যায়। এই লোকায়ত ধারণাকে কবি অপূর্ব প্রতিভায় মিলিয়েছেন। যেখানে নক্ষত্রও তাঁর আপনজন। আমরা, ' হায় চিল' কবিতায় দেখেছি পেয়ে হারানোর বেদনায় সোনালি ডানার চিল হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগায় ।কবিতাটির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে তিরিশের দশকের সন্দেহ, গ্লানি কিভাবে মানুষকে গ্রাস করেছে। চিলের মধ্যে প্রাণসত্তা আরোপ করা হয়েছে। চিল কেবল শুধু চিল নয়, চিলের মধ্য দিয়ে অসহায় মানুষের আর্তনাদ এর প্রতিফলন ঘটেছে। চিল জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত এক পথিক। কবি জীবনানন্দের কাব্যে চিল পাখিটি বিরহী প্রেমিক রূপে এসেছে। সাধারনভাবে চিল এখানে গগনবিহারী নিঃসঙ্গ প্রেমিক। কবিতাটিতে মেঘলা দিনের বিষণ্নতায় যেন প্রেমের বিরহের স্রোত পাঠ করিয়েছেন কবি। এক ভিজে মেঘের দুপুরে একটি চিলকে উড়ে যেতে দেখা যায়। যার সোনালি ডানায় কোনো সুখের উল্লাস নেই, তার উড়ে চলার মধ্যে যে বোধ, জীবনের প্রতি যে ক্লান্তি অনিহা তার ফলেই তাদের চোখের দৃষ্টি আজ স্বচ্ছ নয়।

তথ্যসূত্র

১। তরুণ মুখোপাধ্যায়, কবি জীবনানন্দ : অনুভব, অনুধ্যানে। প্রথম প্রকাশ : ১ লা আগস্ট,২০০০, পারিজাত প্রিন্টার্স ৭, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন,কলিকাতা- ৭০০ ০৬৭,পৃষ্ঠা - ৫০

২। জীবনানন্দ দাশ : জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা। প্রকাশক: ইন্দ্রাণী বর্মন। ভারবি। ১৩।১, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা : ৭৩। পৃষ্ঠা - ৬৫

৩। বাসন্তী কুমার মুখোপাধ্যায় : আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা, চতুর্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা - ২০৮

৪। জীবনানন্দ দাশ : জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা। প্রকাশক: ইন্দ্রাণী বর্মন। ভারবি। ১৩। ১, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা - ৭৩। পৃষ্ঠা - ৪৪

৫। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৪৪

৬। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৪৪

৭। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৪৪

৮। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৪৪

৯। তরুণ মুখোপাধ্যায় : কবি জীবনানন্দ অনুভবে, অনুধ্যানে। প্রথম প্রকাশ : ১ লা আগস্ট ২০০০,পারিজাত প্রিন্টার্স ৭, পৃষ্ঠা - ১৩৬

১০। তরুণ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ১৩৬

১১। জীবনানন্দ দাশ : জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা।প্রকাশক: ইন্দ্রাণী বর্মন।ভারবি।১৩।১। বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট । কলকাতা-৭৩।পৃষ্ঠা - ১১১

১২। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ১১২

১৩। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ১১২

১৪। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ১১৩

১৫। তরুণ মুখোপাধ্যায়: কবি জীবনানন্দ অনুভবে,অনুধ্যান। ১লা আগস্ট ২০০০, পারিজাত প্রিন্টার্স, পৃষ্ঠা - ৯৯

১৬। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রকাশক : ইন্দ্রাণী বর্মন। ভারবি।১৩।১।বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।কলকাতা-৭৩।পৃষ্ঠা - ৫০

১৭। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৫০

১৮। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৫

১৯। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৫

২০। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৫

২১। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৬

২২। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৭

২৩। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৭

২৪। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৫৬

২৫। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৫৬

২৬। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৫৬

২৭। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬২

২৮। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬২

২৯। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৫৯

৩০। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬০

৩১। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬০

৩২। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬০

৩৩। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬০

৩৪। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬০

৩৫। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬০

৩৬। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬০

৩৭। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৪

৩৮। জীবনানন্দ দাশের কবিতার শরীর : ক্ষেত্রগুপ্ত, প্রকাশক : সাহিত্য প্রকাশ, ৬০ জেমস লঙ্ সরণি,কলিকাতা - ৭০০ ০৩৪, পৃষ্ঠা - ১১৫

৩৯। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ইন্দ্রাণী বর্মন।ভারবি।১৩।১,বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট ।কলকাতা - ৭৩ । পৃষ্ঠা - ৬৪

৪০। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৪

৪১। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৪

৪২। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৪

৪৩। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬২

৪৪। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৩

৪৫। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৩

৪৬। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৩

৪৭। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৩

৪৮। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৩

৪৯। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৬৩

সহায়ক গ্রন্থ

১। জীবনানন্দ দাশ : জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ইন্দ্রাণী বর্মন। ভারবি ।১৩ ।১, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা - ৭৩ ।মুদ্রক : এন. বসাক অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস্ । ৯ এ রামধন মিত্র লেন কলকাতা - ৪

২। তরুণ মুখোপাধ্যায় : কবি জীবনানন্দ অনুভবে, অনুধ্যানে। প্রথম প্রকাশ : ১ লা আগষ্ট, ২০০০, পারিজাত প্রিন্টার্স ৭, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৭

৩। জীবনানন্দের কবিতার শরীর : ক্ষেত্রগুপ্ত। প্রথম প্রকাশ : ২৫ শে ডিসেম্বর ২০০৪,প্রকাশক : সাহিত্য প্রকাশ, ৬০ জেমস লঙ্ সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০৩৪, ৩য় মুদ্রণ : ১ লা মার্চ ২০১৩, ডি. ডি. এন্ড কোম্পানি, ৬৫ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট

আকর গ্রন্থ

জীবনানন্দ দাশ : জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ইন্দ্রাণী বর্মন। ভারবি। ১৩।১, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা - ৭৩। মুদ্রক : এন. বসাক অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস্ । ৯ এ রামধন মিত্র লেন কলকাতা - ৪

25/08/23